সংবাদ

27 AUG 2007

আমাদের উচ্চ শিক্ষা-

শিশির কুমার ভট্টাচার্য

[illegible]শিক্ষার অবনতির [illegible]টি কারণ হলো [illegible]দের [illegible]নতির [illegible]মালা। আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] ছিল [illegible] নিয়োগ, [illegible] নিয়োগ। প্রত্যেক ক্যাডারে পদ থাকত সীমিত [illegible]। এক ক্যাডার থেকে আরেক ক্যাডারে নিয়োগ পেতে হলে শিক্ষাগত যোগ্যতার উন্নতি বিধান ছিল অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশে প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পদোন্নতির এমন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে একজন লেকচারারও বছরগুণে প্রফেসর হয়ে যেতে পারবেন। কাজেই লেকচারার পদে একবার নিয়োগ পেলেই নিশ্চিত। তার আর কোন কিছুই করার প্রয়োজন হয় না। যদি পিএইচডি ডিগ্রি বা প্রকাশনা থাকে তাহলে অতি অল্প কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা নিয়েই প্রফেসর পদে উন্নীত হওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে সব পিএইচডির মূল্য সমান, তা সে অক্সফোর্ড ক্যাব্রিজ বা হার্ভার্ড-এর হোক অথবা বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই হোক। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, আমাদের দেশে মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়েই সরাসরি পিএইচডিতে ভর্তি হওয়া যায় এবং দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে সাধারণত ডিগ্রি হয়ে যায়। অথচ এরাই যখন উচ্চ শিক্ষার জন্য উন্নতবিশ্বে গমন করেন তখন সেখানে গিয়ে আগে এমএস বা এমফিল করে তবে পিএইচডিতে ভর্তি সুযোগ পান। তারপরও ডিগ্রির অনিশ্চয়তা থেকে যায়। এমনও দেখা গেছে যে, অনেকেই ডিগ্রি না করে ফেরত এসেছেন। কাজেই দেশী ও বিদেশী পিএইচডি ডিগ্রির মধ্যে যে মানগত একটা পার্থক্য আছে তা সহজেই অনুমেয়। গবেষণার দিক থেকেও আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। সম্প্রতি আমাদের দেশে কিছু কিছু গবেষণা হচ্ছে। তবে তার মধ্যে মৌলিক গবেষণা খুব একটা দেখা যায় না। সুতরাং যোগ্যতার দিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমাদের স্থান অনেক নিচে। বলতে লজ্জা নেই আমরা অনেকেই আছি যারা পাশ্চাত্যের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হওয়ার উপযুক্ত নই। অথচ এখানে আমরা এক একজন সিনিয়র প্রফেসর হিসেবে আছি বা ছিলাম।

নীতিমালার বদৌলতে শিক্ষকদের মধ্যে সবাই প্রফেসর হতে পারছেন। এমনকি কেউ কারোর প্রতিদ্বন্দ্বী নন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় এখন প্রফেসরের সংখ্যাই অধিক। এমনও বিভাগ আছে যেখানে লেকচারার প্রায় নেই বললেই চলে। প্রফেসরদের সংখ্যাধিক্য শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আরেকটি কারণ। বিধি অনুযায়ী প্রফেসর সাহেবরা কম ক্লাস নিয়ে থাকেন। কেননা একজন প্রফেসর অধিকাংশ সময় ব্যয় করবেন গবেষণা কর্মে, এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু আমাদের শিক্ষক মহোদয়রা প্রফেসর হওয়ার সুবাদে ক্লাস কম নেন ঠিকই; কিন্তু তাদের অনেকেরই গবেষণা করার কিছু থাকে না। ফলে জুনিয়র শিক্ষকদের ওপর চাপ পড়ে অনেক বেশি। অন্যদিকে 'প্রফেসর' পদ প্রাপ্তির পর অনেকের আর কোন 'একাডেমিক' প্রত্যাশা থাকে না। জীবনের বাকি সময়টা কাটে ক্ষমতাসীনদের লেজুড়বৃত্তি করে। তাতে অবশ্য কিছু প্রাপ্তিও ঘটে। সাধারণভাবে যারা কখনও সহকারী অধ্যাপকের উপরে উন্নীত হতে পারতেন না, নীতিমালার বদৌলতে তারা আজ প্রফেসর হয়ে ক্ষমতাসীনদের আশীর্বাদে কেউ উপাচার্য, উপ-উপচার্য হচ্ছেন, কেউ হচ্ছেন ডিন, বিভিন্ন কমিশনের মেম্বার, কেউ-বা বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য। যাদের সত্যিকার শিক্ষাগত উৎকর্ষ আছে তারা কিন্তু থেকে যাচ্ছেন পর্দার আড়ালে। কিন্তু প্রশ্ন হলো সবাই কি সব কাজের যোগ্য? কাগজ-কলমে 'প্রফেসর' খেতাব পেলেই কি জ্ঞানের বিস্ফোরণ ঘটে যায়? যিনি কোন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেননি, দেশ-বিদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে যার কোন ধারণা নেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম পরিষদের বিশেষজ্ঞ সদস্য হয়ে কি অবদান রাখতে পারেন। আসলে সঠিক ব্যক্তি যদি সঠিক জায়গায় (right man in the right place) না থাকে তা হলে প্রশাসনের জন্য তা সুফল বয়ে আনতে পারে না। তাতে শুধু ভবিষ্যতের জন্য জটিলতারই সৃষ্টি করে।

নীতিমালার ঢেউ প্রশাসনেও লেগেছে। দেখা যাচ্ছে অফিসারদের নীতিমালার বলে একজন অফিস পিয়নও অফিসার পদে উন্নীত হচ্ছেন। তার ওপরে আছে প্রশাসনিক অনিয়মকেও দলীয়করণ। দলীয়করণ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে বিএ বা বিকম পাস ব্যক্তিকে কারিগরি বিদ্যা ও হিসাব বিজ্ঞান শাখার বিশেষজ্ঞ পদে নিয়োগ দিতে তারা ইতস্তত করেন না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনেও যোগ্য এবং দক্ষ প্রশাসকের অভাব দেখা দিয়েছে। সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে প্রশাসনিক ব্যবস্থা। বস্তুত পক্ষে শিক্ষা এবং প্রশাসন উভয় ক্ষেত্রেই বিরাজ করছে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা যাতে ফলপ্রসূ হয় এবং আমরা আমাদের ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি সে জন্য স্বাধীনতা পরবর্তী সরকার প্রথমেই উদ্যোগ গ্রহণ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার। পাকিস্তানি কালাকানুন বাতিল করে প্রণয়ন করা হয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন। বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণীত হয়ে থাকে সাধারণত সংসদে। তবে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ বলেও তা হতে পারে। আইনের চোখে উভয়ই সমতুল্য। ১৯৭৩ সালে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সংসদে বিশ্ববিদ্যালয় আইন (৭৩) পাস করা হয়। এ আইনের মৌলিক ভিত্তি ছিল গণতন্ত্র। কেননা এক নিদারুণ গণতান্ত্রিক স্পৃহা থেকেই আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা অর্জন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সর্বত্র গণতন্ত্রের প্রতিফলন ছিল প্রত্যাশিত। বিশ্ববিদ্যালয় আইনেও তাই গণতন্ত্রকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এ আইনে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কয়েকটি কমিটি বা সংস্থাকে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সংস্থা ছিল সিনেট, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিল। সিনেটে সর্বস্তরের জনগণের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। সিনেটের সদস্য সংখ্যা বিশ্ববিদ্যালয় ভেদে আলাদা, প্রায় একশ'র কাছাকাছি। এর অধিকাংশই নির্বাচিত সদস্য। এর মধ্যে শিক্ষক প্রতিনিধি আছেন ৩৩ জন। শিক্ষক প্রতিনিধিরাই প্রকৃত পক্ষে সিনেট নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। সিনেটের একটি প্রধান কাজ হলো উপাচার্যের প্যানেল নির্বাচন।

সিনেটে যেহেতু শিক্ষকদের প্রাধান্য তাই প্রায় প্রত্যেক সিনিয়র শিক্ষক অল্পবিস্তর স্বপ্ন দেখেন সিনেটের মাধ্যমে উপাচার্য হওয়ার। কেননা যদি শিক্ষকদের মধ্যে নিজ দল ভারি করা যায় এবং ক্ষমতাসীনদের লেজুড়বৃত্তি করে 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করা যায় তাহলে উপাচার্য হওয়ার এক প্রকার নিশ্চিত। উপাচার্যের পদটি একবার পেলে তখন তার ধ্যান জ্ঞান হয় বিজ্ঞের পদটি ধরে রাখা এবং বিশ্ববিদ্যালয়, দলীয় শাসক পাকাপোক্ত করা। তাতে উপাচার্যের সমর্থকদের ভাগও কিছু প্রাপ্তি ঘটে। গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থকরী পদগুলো দলীয় অনুগতদের মধ্যেই ভাগাভাগি করে দেখা কারণেই শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিবেচনাই প্রাধান্য পায়। শিক্ষক নিয়োগে প্রকৃতপক্ষে ভোটার নিয়োগ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহী সিন্ডিকেট। সিন্ডিকেটের সদস্য সংখ্যা ১৬ থেকে ১৮। এখানেও শিক্ষকদেরই দেখা যায়। কেননা কমিটিতে উপাচার্য উপাচার্য ছাড়া আরও ৬ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি আছেন। তাছাড়া সিনেটের প্র কিংবা বিশিষ্ট নাগরিক প্রতিনিধি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পারেন। সুতর যায়, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার প্রকৃত শিক্ষকদের উপরেই ন্যস্ত। আশা করা গি যে, দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাবিদদের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত হবে উচ্চ শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে। বি হয়নি। আমরা প্রমাণ করেছি যে বিশ্ববিদ্য শিক্ষক হলেও আমরা লোভ-লালসা বা স্বার্থের উর্ধ্বে নই। ক্ষমতা হাতে পেয়েই নীতিমালা প্রণয়ন করে আমাদের পদোন্নতি সহজ করে নিয়েছি। শিক্ষাক্ষেত্রে তা নেতিবাচক প্রস্তাব পড়েছে সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করেছি। শিক্ষা সংক্রান্ত য সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ সংস্থা হলো একা কাউন্সিল একাডেমিক কাউন্সিল গঠনে নি প্রতিনিধি থেকে মেধার ওপর গুরুত্ব আরো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব প্রফেসর সদস্য। এছাড়া অন্যান্য সদস্যও আ নীতিমালার ফলে বর্তমানে একা কাউন্সিলের প্রফেসর সদস্য সংখ্যা এতই বে সভাগৃহে সবার স্থান সংকুলান হয় না। দৃষ্টে মনে হয়, অদূরভবিষ্যতে হয়তো বিরা ঘরে অথবা খোলা মাঠে একাডেমিক কাউ মিটিং করতে হবে।

এই বিপুল পরিমাণ সদস্যের উপস্থি অনেক সময়ই প্রকৃত একাডেমিক সিদ্ধান্ত সম্ভব হয় না। অনেক সময় দেখা সংখ্যাধিক্যের জোরে উপাচার্যের সহা প্রয়োজন অনেকই উপেক্ষা করে দলীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হচ্ছে, তা যে বিভাগীয় পা নির্ধারণই হোক অথবা দুর্নীতির বিরুদ্ধে মূলক ব্যবস্থাই হোক।

বিশ্ববিদ্যালয় এই নিয়ে বিস্তৃত আ আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আগেই বলেছি যে ৭৩-এর বিধান, অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় পরি হয় কয়েকটি কমিটি বা সংস্থা দ্বারা। কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উভয়েই বি একাডেমির কমিটি, প্ল্যানিং কমিটি, কমিটি কোর্সেস, ফ্যাকাল্টি এবং একাডেমিক কাউ অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য রয়েছে সিন্ডিকেট, ফাইন্যান্স কমিটি, প্ল্যানিং ডেভেলপমেন্ট কমিটি ইত্যাদি। আমরা প্রত্যেক কমিটির গঠন ও ক্রিয়া নিয়ে পর্যা করি তাহলে দেখা যাবে যে বিশ্ববি পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বত্রই এক সুচিন্তিত কাজ করছে। এই দর্শন হলো ক্ষ বিকেন্দ্রীকরণ, গণতন্ত্রায়ন এবং জন প্রতিনিধিত্ব। এক কথায়, বিশ্ববিদ্যালয় এই আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা। কিন্তু আমরা এই অপব্যবহার করেছি এবং কখনও ক প্রশাসনিক দুর্বৃত্তায়নে এই উপেক্ষা করে

হডানালভ

সম্প্রতি ইউনিলিভার বাংলাদে [illegible]দের [illegible]রত কর্মকর্তা-[illegible] ছেলে [illegible]য়েরা যারা ২০ [illegible]এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৪ অধিক নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হ [illegible] ও প্রাইমারি বৃত্তি প [illegible]পেয়েছে এবং যেসব ছাত্রছাত্রী পরবর্তী বৃত্তির জন্য কোম্প মনোনীত হয়েছে তাদের এ প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন ক ইউনিলিভার চট্টগ্রামের ফ্যাক্টরিতে অনুষ্ঠিত এ সংবর্ধ ইউবিএলর হিউম্যান রিসোর্সে বিপি বিশ্বাপ্পা প্রধান অতিথি সংবর্ধিতদের ক্রেস্ট ও পুরস্ক করেন।

তথ্য কণিকা

আমেরিকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সি

আমেরিকান ইন্টার ইউনিভার্সিটি ব এমএসসি-ইন-কম্পি সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জি প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য ফরমে আবেদনপত্র করেছে। ভর্তি প সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত যোগাযোগ : আ ইন্টারন্যাশনাল ইউ বাংলাদেশ, হাউজ ন রোড-৪, কামাল

বিভিন্ন প্র

১। বাংলাদেশ কমনওয়েল কততম সদস্য হিসেবে করে?
ক) ৩০তম খ) ৩
গ) ৩২তম ঘ) ৩

২। সম্প্রতি কোন বীরশ্রেষ্ঠর পাকিস্তান থেকে বাংলাদে দাফন করা হয়?
ক) মতিউর রহমান
খ) নূর মোহাম্মদ
গ) হামিদুর
ঘ) মোস্তফা কামাল

৩। বাংলাদেশের সংবিধানে সংশোধনীর মাধ্যমে পুন সংসদীয় সরকার ব্যবস্থ
ক) ২১তম খ) ১
গ) ১৩তম ঘ) ৯

৪। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মহিল
ক) শামসুন্নাহার
খ) রোকেয়া সাখাওয়াত
গ) কামিনী রায়
ঘ) সুফিয়া কামাল

৫। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য দেশ?
ক) ১৩২তম খ) :
গ) ১৩৬তম ঘ) :

৬। ন্যামের বর্তমান সদস্য
ক) ১১৬টি খ) :
গ) ১১৮টি ঘ) :

৭। 'ন্যামুর' কোথায়?
ক) নাইজেরিয়া